আমার জীবন

আমার জীবন

মার্ক শাগাল

অনুবাদ

অদিতি ফাল্গুনী

আমার জীবন
মার্ক শাগাল
অনুবাদ : অদিতি ফাল্গুনী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২৫০ টাকা

Amar Jiban (My Life): an autobiography by Marc Chagall translated by Audity Falguni Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: March 2021
Cell: +88-01717217335, (bkash) +88-01641863570 Phone: 02-9668736
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94933-8-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

মাহমুদা পারভীন
মোজাম্মেল হক ও
সাইয়েদা আকতার।

প্রথম দুজন বন্ধু ও তৃতীয় জনা প্রিয় অনুজা এক।

একদম ছোটবেলায় যে দৃশ্যটি প্রথম আমার চোখে ধরা পড়েছিল, তা একটি লম্বা খোলের বাক্স। সরল, চতুষ্কোণ, অর্ধশূন্য ও অর্ধ ডিম্বাকৃতি। একটি বাজারের বাক্স। বাক্সের ভেতরে কখনো সখনো ঢুকলে আমি একটা ছোট মানুষ, পুরো জায়গাটুকুই জুড়ে দিতে পারতাম।

এখন মনে পড়ছে না সম্ভবত আমার মা-ই আমাকে বলেছিল—ঠিক আমার জন্ম মুহূর্তটিতেই নাকি উইটবস্কের উপকণ্ঠে জেলখানার পাশের রাস্তায় একটি ছোট ঘর হতে বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পুরো শহরটিই জ্বলতে শুরু করে, বিশেষত শহরের সেই জায়গাটা যেখানে হতভাগা ইহুদিরা বাস করত।

এই দুর্ভাগারাই আমাদের বাড়ির লেপ-তোশক, মা ও বাচ্চাটিকে, শহরের একদম অন্যপ্রান্তে একটি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল। তখনও মায়ের পায়ে রক্ত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা বাচ্চাটি।

কিন্তু সবচেয়ে যা গুরুত্ববহ দেখো : আমি তখনও বেঁচে।

আমি যেন জন্মেই বাঁচতে চাইনি। কল্পনা করো, শুভ্র জলবুদ্বুদের মতো একটি বাচ্চা বাঁচতে চায় না। যেন বা শাগালের স্তূপীকৃত চিত্রকর্মে তার শ্বাসরুদ্ধ!

পড়শিরা এই বাচ্চাটিকে প্রথমে পিন দিয়ে খোঁচাল, তারপর এক বালতি পানিতে ডোবাল। অবশেষে বাচ্চাটি দুর্বল গলায় কেঁদে উঠল।

এত কিছুর পরও বেঁচে রইলাম আমি। তাই বলে মনস্তত্ত্ববিদরা যেন আমাকে নিয়ে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত টেনে না বসেন! ঈশ্বর রক্ষা করুন! যাহোক পেস্কোয়াতিক রাস্তার কাছে সেই ছোট বাড়িটা এখনও অক্ষত দণ্ডায়মান। বেশি দিন হয়নি, আমি বাড়িটা দেখেছি।

আর্থিক অবস্থা আর একটু ভালো হলে বাবা এই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এটা আমাকে মনে করিয়ে দিল সেই রাব্বির মাথার ফোঁড়াটির কথা, যে রাব্বিকে আমি অনেক পরে সবুজ রঙে এঁকেছিলাম। মনে করিয়ে দিল হেরিং মাছভর্তি পিপেয় ছুড়ে দেয়া, লবণে জারানো আলুর কথা। আমার এই যুবক 'শরীর'—আজ এতটা কাল পরে সেই পুরনো বাড়ি দেখে ভাবল, 'কী করে সম্ভব যে আমি এখানে জন্মেছি? এই গর্তের ভেতর কারও পক্ষে শ্বাস নেয়া সম্ভব?'

কিন্তু আমার পিতামহ যখন তার দীর্ঘকৃষ্ণ শ্মশ্রু সঙ্গে করে মারা গেলেন অবিচলিত গাম্ভীর্যে, আমার বাবা অল্প কিছু রুবল খরচায় অন্য একটি স্থানে বাড়ি কিনলেন। পেস্কোয়াতিকের বাড়িটার মতো এখানকার বাড়ির পাশে কোনো

পাগলাগারদ নেই। চার্চ, দোকানপাট, সিনাগগ সব সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উভয় পার্শ্বেই গিওডোর ফ্রেস্কোগুলোয় বন্দি যত সরল ও শাশ্বত নানা স্থাপত্যকর্মের মতোই।

আমার চারপাশে, নানা প্রকৃতির ইহুদিরা, বুড়ো ও তরুণ জাভিস্তেশগণ, বেজলিন প্রমুখ ক্রমাগত ঘোরাফেরা করে। ঘোড়ার দুলকি চালে তারা নিরন্তর পাক খায়। একজন ভিখিরি এইমাত্র তার বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল, একজন ধনী ব্যক্তি ঘরে ফিরছেন। পনির বিক্রেতা ছেলেটি ঘরে ফিরছে। বাবাও ঘরে ফিরছে।

সেই সময়ে সিনেমা বলতে কিছু ছিল না। বাড়ি আর দোকানগুলোতেই ছিল মানুষের আসা-যাওয়ার চৌহদ্দি। বাজারের ঐ ঢালু খাদঅলা জায়গাটুকু ছাড়া বাকি এটুকুই আমার খুব ছোটবেলার স্মৃতি হিসেবে মনে আছে।

এই যা : এতক্ষণ হয়ে গেল। প্রিয় পাঠক, আপনাদের আমার ছোটবেলার আকাশ ও নক্ষত্রবীথি সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না।

আছে-আছে আমার মিষ্টি, প্রিয় নক্ষত্ররাজি। স্কুলে যাওয়ার পথে তারা আমাকে সঙ্গ দেয়। অর যতক্ষণ না ফিরে আসি, ওরা আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করে। ছোট্ট নক্ষত্ররা, ক্ষমা করো আমাকে! কেমন ঘুমপাড়ানো মেঘের দেশে তোমাদের একা রেখে এসেছি।

বিষণ্ন, উল্লসিত শহর আমার!

যখন বালক ছিলাম, নিতান্ত শিশুর কৌতূহলে, দরজা থেকে তোমাদের হাঁ করে দেখতাম। বালকের চোখে তোমাদের বড় স্বচ্ছ বোধ হতো। বাড়ির সামনের উঁচু বেড়ার কারণে কখনো যদি তোমাদের দেখতে না পেতাম, তবে একটি ছোট্ট কাঠের খুঁটি বেয়ে উপরে উঠতাম। এ করেও যদি তোমাদের দেখতে না পেতাম, তাহলে সোজা ছাদে উঠে যেতাম। যাব নাই বা কেন? আমার পিতামহেরও ছাদে উঠবার অভ্যাস ছিল। তোমাদের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে দেখতাম।

পোক্রোভাকাজা রাস্তায় এভাবেই দ্বিতীয় জন্ম হয়েছিল আমার।

ফ্লোরেনটাইন চিত্রকর্মে প্রায়শই যে আচাঁছা দাড়িবিশিষ্ট, বাদামি কি ছেয়ে ধূসর দৃষ্টি এবং পোড়া গিরিমাটিরঙা ত্বকে অজস্র রেখা ও কুঞ্চনবিশিষ্ট মানব প্রতিকৃতি দেখা যায়, আপনারা তাদের ভালোভাবে লক্ষ করেছেন কি?

আমার বাবা ছিলেন এমনই চেহারার এক পুরুষ। অথবা হাগগাধার হাস্যকর প্রকাশভঙ্গিসম্পন্ন ফিগারগুলো আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন (আমাকে ক্ষমা করো, বাবা!)

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে বাবা যে একবার আমি তোমার একটি স্টাডি করেছিলাম। তোমার পোর্ট্রেট দেখে মনে হয় যেন একটি মোমবাতি জ্বলে উঠেই নিভে গেল। মোমবাতির সুঘ্রাণ, ঘুমেরও।

একটি মাছি ভনভন করছে—মরুক গে যাক! একটানা ভনভনানিতে ঘুম পাচ্ছে আমার। আমাকে কি আমার বাবার কথা বলতেই হবে?

একজন পুরুষ মানুষের বলার মতো যদি কিছু না-ই থেকে থাকে, তবে তার কথা বলে কী লাভ? যদি জাগতিক জীবনে সে হয়ে থাকে নিছকই মূল্যহীন? আর এজন্যই তার সম্পর্কে বলতে গেলে সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়াটা আমার জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে।

আমার দাদামশাই ছিলেন ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষক। তার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ আমার বাবাকে হেরিং মাছের পাইকারি বিক্রেতা একটি দোকানের কেরানি ও তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রকে নাপিতের পেশায় নিযুক্ত করা ছাড়া আর কোনো পেশা তিনি খুঁজে পাননি। না, আমার বাবা কেরানি ছিলেন না আসলে। বত্রিশ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন দিনমজুর মাত্র। আর কিছুই না। হেরিং মাছে ভর্তি বিশাল আকৃতির পিপেগুলো তিনি বহন করতেন। আমার ছোট্ট আত্মাটি টার্কিশ প্রিটৎসেল বিস্কুটের মতো ভেঙে যেতে চাইত, যখন তাকে দেখতাম অমন ভয়ংকর ওজন তিনি পিঠে বয়ে বেড়াচ্ছেন বা বরফ জমাট আঙুল দিয়ে ছোট্ট হেরিং মাছগুলোকে নাড়া দিচ্ছেন। পাশে তার মোটা মনিব দাঁড়িয়ে থাকতেন নিশ্চল জন্তুর মতো।

বাবার কাপড়ে মাঝে মাঝেই হেরিং মাছের লবণের দানা চকচক করত। আলো তার চারদিকে খেলা করত। তার মুখ এই পাণ্ডুর, এই স্বচ্ছ—মাঝে মাঝে বিবর্ণ হাসিতে ভরে উঠত।

কী অসাধারণ সেই হাসি। কোথা থেকে আসত এমন হাসি?

এই হাসি আসত সেইসব রাস্তা থেকে যেখানে ছায়ামূর্তি পথচারীরা হাঁটত, চাঁদের আলোয়, এরই মাঝে হঠাৎই তিনি চমকে দিতেন তার সাদা দাঁতের দীপ্তিতে। তার দাঁত আমাকে মনে করিয়ে দিত বিড়ালের দাঁত, গরুর দাঁত, যেকোনো কিছুর দাঁতকেই।

আমার বাবার সবকিছুই ছিল কেমন বিষণ্ন ও রহস্যে ঘেরা। অনতিক্রম্য এক প্রতিমূর্তি। প্রতিমুহূর্তে ক্লান্ত, প্রতিমুহূর্তে বিপন্ন—শুধু তার নীলাভ-ধূসর চোখে ছিল উজ্জ্বলতা। খসখসে, কাজধ্বস্ত কাপড়ে তিনি ঘরে ফিরতেন। কৃশ ও দীর্ঘকায়, মলিন-লাল একটি রুমাল পকেটে ঝুলছে। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাদের ঘরে ঝুপ করে নেমে আসত সন্ধ্যা।

পকেট হতে ছোট ছোট কেক আর হিমার্দ্র নাশপাতি বের করে আমাদের ভাইবোনদের ভেতর ভাগ করে দিতেন তিনি তার দোমড়ানো বাদামি হাতে। আমাদের মুখে এইসব ছোটখাটো খাবার যখন তিনি নিজ হাতে পুরে দিতেন, তখন টেবিলে ডিশ থেকে আসা খাবারের চেয়ে এসব খাবার অনেক বেশি সুস্বাদু মনে হতো। যেসব সন্ধ্যায় বাবা তার পকেট থেকে কেক এবং নাশপতি বের করতেন না, সেসব সন্ধ্যা আমাদের জন্য ভারি দুঃখদায়ী হতো। আমি ছিলাম একমাত্র জন যে তাকে সত্যিই চিনতাম। সেই সরল হৃদয়, কাব্যিক ও নৈঃশব্দ্যপীড়িত মানুষটিকে। জীবনের একদম শেষের মহার্ঘ বছরগুলোয় তিনি কিছু টাকাকড়ি

জমাতে পেরেছিলেন। ক্রেতাদের কাছ হতে পাওয়া ছোটখাটো বখশিশ তার ঈষৎ আয় বর্ধনে সহায়ক হয়েছিল।

তার তরুণ বয়সের ফটোগ্রাফ ও আমাদের বাড়ির ওয়াড্রোব পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি যখন আমার মাকে বিয়ে করেন তখন তার কিছু শারীরিক ও আর্থিক সংগতি ছিল। কেননা তিনি তার প্রেমিকাকে বিয়ের সময় (না তখন নিছকই কিশোরী, বিয়ের পরে অনেকদিন ধরে যার বাড় বাড়ন্ত হয়)—একটি জমকাল শাল দিয়েছিলেন।

বিয়ের পর দাদামশাইয়ের হাতে রোজগারের টাকা তুলে দেয়া বন্ধ করে বাবা তার নিজের সংসার চালাতে শুরু করলেন। কিন্তু না। সবার আগে আমার দাড়িঅলা দাদামশাইয়ের ছবিটি আমি স্পষ্ট করে এঁকে নিতে চাই। আমি জানি না, তিনি দীর্ঘদিন ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষকতা করেছেন কিনা। তবে সবার ভাষ্য অনুসারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত এক ব্যক্তি।

আজ থেকে দশ বছর আগে দাদিমার সঙ্গে তার কবরস্থান দেখতে গিয়ে আমি তার নামে স্মৃতিসৌধ দেখি এবং বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে সত্যিই তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মূল্যাতীত এক ব্যক্তি ছিলেন আমার দাদামশাই, একজন তাপস। আজ তিনি নদী তীরে কালোরঙা বেড়ার পাশে নিশ্চুপ শুয়ে আছেন, যেখানে আর্ত নদীজল হু হু করে বয়ে চলে। পাহাড়ের নিচে, অন্যান্য 'সন্তদের' পাশে দীর্ঘকাল হয় তিনি শায়িত।

কিছুটা ক্ষয়ে গেলেও তার কবরের গায়ের পাথরটি আজও অক্ষুণ্ন হিব্রু অক্ষরে নামলিপি উৎকীর্ণ : 'এখানে শায়িত...'

আমার পিতামহী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই বলে, 'এখানেই তোমার দাদামশাইয়ের অর্থাৎ তোমার বাবার বাবার এবং আমার প্রথম স্বামীর কবর।' ফিসফিস করে কথাগুলো বললেন দাদিমা, যেন বা তিনি কাঁদতেও অক্ষম। কথাগুলো যেন তার নিজের জন্যই উচ্চারিত। অথবা প্রার্থনামালা। আমি তার টানা বিলাপ শুনে চললাম, দাদামশাইয়ের নামাঙ্কিত পাথরের ওপর নুয়ে পড়ে তিনি কাঁদছিলেন, যেন বা ঐ পাথর এবং মাটির স্তূপ আমার দাদামশাই স্বয়ং! যেন বা পিতামহী মৃত্তিকার গভীরতম স্তরের কাছে মিনতি করছেন, যেন বা কবরটি একটি কাপবোর্ড এবং আমার দাদামশাই এক সুনিশ্চিত বস্তু হিসেবে তার ভেতর সিলকৃত রয়েছেন : 'হে দাভিদ, আমাদের করুণা করো। এই তোমার বাথশেবা। তোমার অসুস্থ পুত্র, নাতি, দুর্বল জুসি ও সন্তানদের কৃপা করো দাভিদ। কৃপা করো যেন তারা ঈশ্বর এবং মানুষের সামনে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারে।'

আমি আমার পিতামহীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এই ভালো মানুষ বৃদ্ধাটি ছিলেন কুঞ্চিত মুখাবয়বের ওপর শাল জড়ানো, ছোট্ট স্কার্টের একটি পোটলা। টেনেটুনে চার ফুট লম্বা ছিলেন তিনি। অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা তিনি জড়ো করে

রেখেছিলেন তার আদরের সন্তানদের জন্য এবং তার উপাসনা বইটির জন্য। বিধবা হওয়ার পর, রাব্বির আশীর্বাদ নিয়ে তিনি আবার বিয়ে করেন। তিনি বিয়ে করেন আমার মাতামহ অর্থাৎ মার বাবাকে। মাতামহ নিজেও বিপত্নীক ছিলেন। তার স্ত্রী মারা গেছিলেন আমার বাবা-মার বিয়ের বছরে।

আমার হৃদয় প্রায়শই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়—এ কি ক্লান্তি না হঠাৎ স্মৃতির ক্ষরণ? বিশেষত প্রতিবছর মায়ের মৃত্যুদিনে আমি যখন তার কবর পরিদর্শনে যাই, তখনি এমন হয়।

মা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

আমার কাছে প্রতিদিন কেমন ধীরলয়ে হেঁটে আসো তুমি। এত ধীরে হাঁটো যে আমি তোমাকে সাহায্য করার জন্য উঠে দাঁড়াই। ঠিক আমার হাসিটাই হাসো তুমি। আমার হাসিটা যে তোমার কাছ থেকেই পাওয়া।

লিওজনোতে আমার মায়ের জন্ম যেখানে আমি পুরোহিতদের ঘর এঁকেছি, এঁকেছি ঘরের সামনের বেড়া, বেড়ার সামনে চড়ে বেড়ানো শূকরের পাল। পোপ হন আর নাই হন, স্মিত হাসিতে আমার মাতামহ যখন হেঁটে যেতেন, তার ক্রস ঝকঝক করত, আমার ওপর ঝুঁকে স্বস্তিচিহ্ন এঁকে দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। নিতম্বে ঘষতেন তিনি। শূকরের পাল কুকুরছানাদের মতো ভোঁ দৌড়ে তার কাছে আসত।

মা ছিলেন মাতামহের সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যা। মাতামহ তার জীবনের অর্ধেক পার করেছেন চুল্লির পাশে শুয়ে, এক চতুর্থাংশ সিনাগগে এবং বাদবাকিটা কসাইয়ের দোকানে। জীবনের বেশিরভাগ সময় মাতামহ এতটা বিশ্রাম নিয়েছেন যে দিদিমা মনস্তাপে অল্পবয়সেই মারা গেলেন।

দিদিমার মৃত্যুটাই যেন দাদুকে জোর ঝাঁকুনি দিল। সুতরাং বাড়ির গরু বাছুররাও ঝাঁকুনি খেল। আচ্ছা, আমার মা কি সত্যিই এতটা বেঁটে ছিলেন?

বাবা মাকে না দেখেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেটি ছিল ভুল।

আমাদের চোখে মাকে মনে হতো ব্যতিক্রমী স্টাইলের অধিকারিণী, যা এতটা সাধারণ পরিবেশে সচরাচর দেখা যায় না। তবে মাকে অতি প্রশংসা করার ইচ্ছাও আমার নেই, যে মা কিনা নেই-ই। তার সম্পর্কে কিই-বা আর বলা যেতে পারে?

মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু না বলে বরং কাঁদি।

কবরখানার দরজা বরাবর আমি ছুটে যাই। আলোকশিখার চেয়েও লঘুতর এক বায়বীয় ছায়ামূর্তি, কাঁদতে দ্বিধা বোধ করি। দূরে প্রবহমান নদীকে দেখি, তার ওপারে ব্রিজ, মাটি ও কবর।

এখানে আমার আত্মা, দেখো, এখানেই আমি; এখানেই আমার আঁকা যত ছবি, আমার শেকড়। বিষাদ, বিষাদ!

এ আমার মায়ের পোর্ট্রেট। কী অর্থ এর? আমার মায়ের পোর্ট্রেট কি আমারও নয়? আমি কে?

আপনারা হাসবেন, আগন্তুক পথিকেরা, আপনারা কৌতুক বোধ করবেন, হাসবেন। যন্ত্রণার হ্রদ, অকালপলিত কেশ, চোখ—কান্নার পৃথিবী, অনস্তিত্ব আত্মা, শূন্য মস্তিষ্ক।

মাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সারা ঘরে কর্তৃত্ব করছেন, বাবাকে সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, পয়সা জমানোর জন্য ছোট ছোট ঘট তৈরি করেই চলেছেন, মুদির দোকান চালু করছেন, ধারে গাড়ি বোঝাই সওদাপাতি কিনে ফিরছেন।

জানি না কোন অক্ষরমালায় তাকে আমি আঁকব—দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিলে বসে অপেক্ষা করছেন কোনো সহৃদয়া পড়শির জন্য, যার কাছে আত্মাকে উজাড় করে দিতে পারেন? সন্ধ্যাবেলায় যখন দোকান বন্ধ হয়ে যেত এবং শিশুরা সব ঘরে ফিরত, বাবা টেবিলের ওপর ঝিমোতেন, বাতিটা জিরোত আর চেয়ারগুলো হাঁপিয়ে উঠত একঘেয়েমিতে, বাইরে জগতে কী ঘটে চলেছে তখন, তোমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। বলা সম্ভব নয় আকাশ কোথায়, প্রকৃতি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এমন নয় যে আমরা খুব চুপচাপ থাকতাম, তবে আশপাশের সবকিছুই থাকত খুব শান্ত। এক হাত টেবিলে অন্য ছাতটি পেটে রেখে মা লম্বা চুল্লিটির সামনে বসে থাকতেন। তার মাথাটি ততটুকুই লম্বা মনে হতো যেখানে তার চুল একটি পিনে আটকানো থাকত। অয়েলক্লথ বিছানো টেবিলে প্রায়শই তিনি তার আঙুল দিয়ে টোকা দিতেন। যার অর্থ ছিল : 'প্রত্যেকেই ঘুমাচ্ছে। কী বাচ্চারা! আমার কথা বলার কেউ নেই!' কথা বলতে মা খুব ভালোবাসতেন। তার শব্দবিন্যাস এত চমৎকার ছিল যে, শুনতে শুনতে শ্রোতারা মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত হতো এবং হাসত।

রানি-প্রতিমা, মা যেন ঋজু ও নিশ্চল তার নিষ্কলুষ কেশবিন্যাসে, তিনি কখনো প্রশ্ন করতেন, চুপ থাকতেন, অথবা কথা বলতেন, যদিও তার ঠোঁট নড়ত খুব সামান্যই। অথচ তিনি যখন কথা বলতেন, তার সামনে কেউ থাকত না। থাকতাম শুধু আমি, দূর থেকে তাকে লক্ষ করে যেতাম। রোজ তিনি বলতেন, 'কীরে ছেলে? মায়ের সঙ্গে কথা বলবি না? কথা বল!' তা আমি তখন একটি ছোট্ট ছেলে। আর মা যেন রানি। তাকে কিই-বা বলতে পারি আমি?

ক্রসের মতো বসে, টেবিলে আঙুল ঠুকে তিনি তবলা বাজিয়ে চলেছেন।

গোটা ঘর বিষাদের পর্দায় মোড়ানো। শুক্রবারগুলোয়, সাবাথ মধ্যাহ্নভোজনের পরে বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়বেনই পড়বেন, প্রার্থনা শেষ না করেই (এসব কথার জন্য হাঁটু গেঁড়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বাবা!) মার চোখ বিষণ্ন হয়ে আসত এবং তিনি তখন তার আট সন্তানকে বলতেন : 'বাচ্চারা, এসো আমরা রাব্বির গান করি, আমাকে সাহায্য করো।' বাচ্চারা গান করত এবং ঘুমিয়ে পড়ত। তিনি তখন

কাঁদতে শুরু করবেন এবং আমি তাকে বলতাম : 'তুমি আবার কাঁদছ? আমি তাহলে আর গান করব না।'

আজ আমার মনে হয় আমার ভেতরে যা কিছু প্রতিভা আমার মার কাছ থেকে পাওয়া। শুধু তার মনোবল আমি পাইনি।

আমার দরজায় ঐ তো মা দাঁড়িয়ে (জাভিৎচে, আদালত প্রাঙ্গণে)।

তিনি দরজায় টোকা দিচ্ছেন এবং জিজ্ঞাসা করছেন : 'বাবা, তুই কোথায়? কী করছিস? বেলা তোকে ঠিকমতো দেখছে? খেতে পাচ্ছিস?'

'মা, দেখো তো'—এটা পছন্দ হচ্ছে?' মা আমার পেইন্টিংসের দিকে তাকালেন, ঈশ্বরই জানেন কেমন আকুল চোখে? আমি আদালতের রায়ের অপেক্ষা করছি। অবশেষে মা থেমে থেমে বললেন :

'হ্যাঁ বাবা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোর প্রতিভা আছে। কিন্তু আমার কথা শোন। তোর হয়তো কোনো অফিসে কেরানির চাকরি পেলে ভালো হতো। কোথা হতে এত প্রতিভা পেলি তুই?'

মা শুধু আমাদের মা-ই ছিলেন না। তার ছোট বোনদের সঙ্গেও তার আচরণ ছিল মায়েরই মতো। তাদের একজনের যখন বিয়ের জন্য কথাবার্তা চলছিল, আমার মা-ই ঠিক করলেন যে পাত্র তার বোনের উপযুক্ত কিনা। তিনি বিচার করতেন, খোঁজ-খবর করতেন বোনদের সম্বন্ধের ব্যাপারে। যদি হবু পাত্র অন্য শহরের বাসিন্দা হতেন, হাতে ঠিকানা পাওয়া মাত্র মা সেখানে চলে যেতেন, দোকান থেকে সামান্য কিছু উপহার কিনে হবু পাত্রের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেন। রাত ঘনিয়ে আসলে এমনকি তিনি সেই যুবকের জানালা গলিয়ে উঁকি দেয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করতেন!

মা মারা গেছেন, আজ কত বছর হলো। ছোটখাটো মা আমার, কোথায় তুমি? স্বর্গে, না মর্ত্যে? আমি এখানে, তোমার থেকে অনেক দূরে, কী খুশিই না হতাম যদি তোমার কাছাকাছি আসতে পারতাম, অন্তত পক্ষে তোমার সৌধটা যদি দেখতে পারতাম, ছুঁতে পারতাম তোমার কবরের পাথর। আহ। মা। আজকাল আর প্রার্থনা করতে পারি না, কাঁদতেও। কিন্তু সারাক্ষণই তোমার কথা মনে করি, বিষাদে ডুবে যায় আমার চিন্তাসমূহ।

আমি তোমাকে আমার জন্য প্রার্থনা করতে বলি না। তুমি নিশ্চয়ই জানো কীসে আমি কষ্ট পাই। ছোট্ট মা, বলো! আমাকে অন্য পৃথিবী, স্বর্গ কিংবা মেঘের ওপারে, কোথায় আছ তুমি? আমার ভালোবাসা কি তোমাকে এতটুকু হলেও স্বস্তি দিচ্ছে? আমার শব্দাবলি কি এতটুকু ছুঁতে পারছে তোমায়?

কবরস্থানে সেই নারীর পাশে শায়িত রয়েছেন মহিলেফ অথবা লিওজনোর আরও কত নাম না জানা নারী। বিশ্রামে নিমজ্জিত আত্মাগণ। চৌচির ভগ্ন যত হৃদয়, নানাবিধ শৈত্যবোধে আক্রান্ত। এ সমূহ শৈত্যবোধই আমার পরিচিত। এ সেই সাহসের চিহ্ন, যে সাহসিকতা আমার গোলাপিবর্ণ তরুণী দিদিমাকে হত্যা করেছিল। আমার অলস মাতামহ যখন সিনাগগে বা চুল্লির পাশে ঘুমিয়ে দিন পার করতেন। সন্তানদের খাওয়া পরা নিশ্চিত করার জন্য একা মেয়ে মানুষকে দুঃসাহসিক লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। প্রায়শ্চিত্ত দিবসে (Day of Atonement) উপবাসের পরে, কিংবা নববর্ষের পূর্বদিনের চন্দ্রপ্লাবিত সন্ধ্যায় কতই না মুখোমুখি হয়েছি দিদিমার এই রূপকথাতুল্য সাহসের।

প্রিয় বুড়ো দাদু আমার—কেন এত কষ্ট দিয়েছিলে দিদিমাকে?

মাতামহ, তোমাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। ভালোবাসতাম লিওজনোতে তোমার ঘরখানা, গরুর চামড়ার গন্ধে পরিপূর্ণ! ভালোবাসতাম তোমার ভেড়ার চামড়ার কোট। ঘরে ঢুকবার মুখেই তোমার ওয়াড্রোবের সমস্ত কাপড় চোপড় দেখা যেত ঝুলছে। হয় দরজায়, নয়তো কোটস্ট্যান্ডে কোট, গাদাখানেক টুপি, চাবুক ও আনুষঙ্গিক অন্য নানা জিনিসপত্র এ সবকিছু মিলিয়েই দেয়ালের ধূসর প্রেক্ষাপটে এক অদ্ভুত ছায়াচিত্রের সৃষ্টি হতো। যা আমার নিবিষ্ট মনোযোগে অধ্যয়ন করা হয়নি হয়তো। এ সবটা নিয়েই আমার মাতামহ।

তার গোয়ালঘরে বিশাল উদর এক গাভি স্থির দাঁড়িয়ে থাকত। নিশ্চল দৃষ্টিতে।

মাতামহ তার কাছে গিয়ে বলত : 'শোনো, তোমার ঠ্যাং দুটো আমাদের দাও। তোমাকে শক্ত করে বাঁধতে হবে। আমাদের কিছু মাংস বিক্রি করা প্রয়োজন, শুনতে পাচ্ছ?'

গাভিটি কী বুঝত জানি না, নিশ্বাস ফেলত। আমি তখন পশুটির মুখে হাত বুলিয়ে দিতাম, ফিসফিসিয়ে দু-একটি কথা বলতাম—চিন্তার কিছু নেই, আমি অন্তত তোমার মাংস খাব না; এর বেশি কিই-বা করতে পারতাম আমি তখন?

অবোধ পশুটি ঠিক যেন শুনতে পেত রাই শস্যের মৃদু হিল্লোল, বেড়ার ওপাশের নির্নিমেষ অনন্য নীল আকাশ। কিন্তু কসাই তার সাদা-কালো শার্টের আস্তিন গুটিয়ে ছুরি হাতে শান দিত। গলা ধরে ছুরির পোঁচ দেবার আগে প্রার্থনামন্ত্র দায়সারাভাবে পড়ত কি পড়ত না।

রক্ত স্রোত।

পশু জবাইয়ের এমন মুহূর্তে—বেশ মনে আছে, বাড়ির কুকুর ও মুরগিরা নির্বিকারভাবে অপেক্ষা করত যে কখন একফোঁটা রক্ত বা তাদের ভক্ষণযোগ্য খাবারের একটি ডেলা মাটিতে ছিটকে পড়বে।

চর্বি ও রক্তস্রোতের ভেতরে দাদুর দীর্ঘশ্বাস আর কুকুর ও মোরগ-মুরগিদের খসখস ঘষাঘষির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না।

এবং তুমি, ছোট্ট গরু, উলঙ্গ ও ক্রুশবিদ্ধ, স্বর্গে বসে স্বপ্ন দেখছ তুমি। কসাইয়ের ঝলমলে ছুরি তোমাকে অমরাবতীতে আরোহণ করালো কি?

নৈঃশব্দ্য।

তোমার অন্ত্রসমূহের সন্ধি ছুটে যাচ্ছে—খসে পড়ছে টুকরো মাংস। ছাল ছাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। গোলাপি, রক্ত-লাল মাংসের টুকরো। ধোঁয়া উড়ছে। মনে হচ্ছে যেন সেদিনের সেই মাংস আজ খাচ্ছি।

প্রতিদিন এমন দুটো কী তিনটা গরু জবাই করা হতো, ভালো মাংস দেয়া হতো জমির মালিক ও দাদুরই মতো অন্য ভাড়াটেদের। আমার দাদুর বাসাকে মনে হতো শিল্পের শব্দ-গন্ধে পরিপূর্ণ এক আবাস-গৃহ। রাতের অন্ধকারে শুধু গন্ধ নয়, মনে হতো যেন বাড়ির যা কিছু ভালো, যা কিছু শুভময়, দেয়াল ভেঙে উড়ে যাচ্ছে শূন্যে।

প্রতিদিন নিষ্ঠুরভাবে গরু জবাই করা হতো। আমি তো মেনে নিয়েছিলাম। চামড়াগুলো বেশ শাস্ত্রসম্মতভাবেই ছাড়ানো হতো, কোমল প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করা হতো, স্বর্গের প্রতিনিধিদের কাছে জীবহত্যার জন্য ক্ষমা চাওয়া হতো। দিদিমা আমাকে সবসময় মাংস রোস্ট, কাবাব ও সেদ্ধ করে খাওয়াতেন। বিশেষত পাকস্থলী, গলা, পাঁজর, কলিজা ও ফুসফুস রান্না করে খাওয়াতেন। শৈশবের সেই দিনগুলোয় আমি ছিলাম খুব বোকা ও সুখী।

দাদু, তোমার কথা আমার খুব মনে পড়ে। একবার এক নগ্ন নারীর স্কেচ দেখে মাতামহ সরে দাঁড়ালেন ও পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন এমনভাবে যেন স্কেচটি আদৌ তার এখতিয়ারের বিষয় নয়, অথবা যেন বাজারস্থানে এমন একটি নক্ষত্র খসে পড়েছে, যা নিয়ে বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের কোনো ভাবনা নেই। আর তখনি শুধুমাত্র আমি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারলাম যে, দাদু ও দিদিমা শিল্প সম্পর্কে একদমই চিন্তিত নন (বিশেষত যে শিল্প একদমই দুর্বোধ্য), বরং মাংসকে তারা উচ্চমূল্য দিয়ে থাকেন।

এ কথাটিই মা তার বাবা সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন। কিংবা হতে পারে আমি স্বপ্নে এমন দেখেছি। সুক্কোত অথবা সিমশতি তোরাহ পর্বের ভোজ। সবাই দাদুকে খুঁজছে। কোথায় তিনি? কোথায় তিনি? এমন তো হতেই পারে যে চারদিকে বেশ মিষ্টি আবহাওয়া, মাতামহ ছাদে উঠেছেন, বসেছেন চিমনির ওপর, রাজকীয় মহিমায় গাজর খাচ্ছেন। খুব মন্দ চিত্র নয়।

আমি আশা করব যে, আনন্দ ও স্বস্তির সঙ্গে, দর্শক আমার ছবির হেঁয়ালির পেছনে আমার শৈশবের স্বজনদের নানা নিষ্পাপ কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করবে।